باسمه‌تعالی

হালাল কামাই

মুফতী মনসূরুল হক

www.darsemansoor.com

সূচিপত্র	পৃষ্টা
মু'আমালা বা হালাল রিযিক	৩
জীবিকা উপার্জনের বৈধ পন্থা	৪
তাফসীরঃ	৫
হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করা	৬
চাকুরীর বৈধতার শর্তসমূহ	৮
ইসলামী ব্যবসানীতি	৯
শেয়ার ও বর্তমান শেয়ার বাজার	১১
শেয়ারের শর'ঈ বিশ্লেষণ	১১
শেয়ারের মূল্য	১২
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর'ঈ বিধান	১৪
সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের হুকুম	১৬
শর্তগুলো যথাক্রমে	১৭
বর্তমান শেয়ার বাজারের শরঈ বিধান	১৮
যারা শেয়ার-ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে শরী'আতের হুকুম কী?	১৯
ব্যাংক ডিপোজিটের প্রকারভেদ ও তার শরয়ী বিধান	২১
ব্যাংকিং পরিভাষায় ব্যাংক ডিপোজিট চার প্রকার	২১
ব্যাংক ডিপোজিটগুলোর শরয়ী অবস্থান	২২
সাধারণ ব্যাংগুলোতে অর্থ রাখার শরয়ী হুকুম	২৩
ইসলামী ব্যাংকগুলোর হুকুম	২৫
অমুসলিম দেশের ব্যাংকের হুকুম	২৭
সুদী টাকার হুকুম	২৮
শরী'আতের দৃষ্টিতে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসা	৩০
এম.এল.এম.তথা মাল্টিলেভেল মার্কেটিং এর পরিচয়	৩০
এম.এল.এম এর শরয়ী হুকুম	৩১
শরী'আতের দৃষ্টিতে বেচা-কেনা	৩৩
বেচা-কেনার সংজ্ঞা	৩৩
বেচা-কেনার প্রকারভেদ	৩৪
শর'ই হুকুম	৩৫
বেচা-কেনার মূলনীতি	৩৬
বেচা-কেনার প্রচলিত কয়েকটি সূরত এবং তার শর'ই বিধান	৩৭

মু'আমালা বা হালাল রিযিক

মু'আমালা যথাযথ হওয়া এটা পুরুষের জন্যও কর্তব্য, মহিলার জন্যও অর্থাৎ রিযিক ও সব রকম লেনদেন হালাল হওয়া। যত কেনা-কাটা, ব্যবসা-বাণিজ্য যা আছে সব মু'আমালাতের মধ্যে দাখিল। এক কথায় আমরা বলি, হালাল রিযিক।

এই হালাল রিযিকের ব্যাপারে তৎপর ও সাবধান হওয়া স্বামীর যেমন জরুরী, স্ত্রীরও তেমন জরুরী। এটা বলতে পারবে না যে, স্বামী কোত্থেকে আনে, সেটা কি আমি বলতে পারি? এমনও হতে পারে যে, স্বামী মাসআলাই জানে না বা স্ত্রীকে এমন টাকা দিয়েছে, যা তার জন্য হালাল নয়। দরকার হয় তার কাছ থেকে জিজ্ঞাস করে নিতে হবে। কারণ, সে হালাল তরীকায় উপার্জন করছে, না হারাম তরীকায়, তার তাহকীক প্রয়োজন। কোন হারাম রিযিক দ্বারা যে রক্ত-গোশত হবে, এই রক্ত-গোশত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই স্বামীর রিযিক যাতে হালাল আসে, এই দিকে স্ত্রীর খেয়াল রাখতে হবে এবং স্বামীকে বলে দিবে, খবরদার! আপনি কখনো হারাম রিযিকের দিকে যাবেন না। আমরা যেভাবেই হোক, জাউ-রুটি খেয়ে থাকতে রাজী আছি, ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরে থাকতে রাজী আছি, কিন্তু হারাম ভাবে পয়সা এনে আমাদেরকে পোছপাছে রাখার প্রয়োজন নেই। অনেক মা-বোন বোঝে না। তারা স্বামীকে এত বাধ্য করে, এত চাপ সৃষ্টি করে যে, অবশেষে স্বামী নিরুপায় হয়ে হারাম ভাবে টাকা জোগাড়ের পন্থা খোঁজে। যখন সে দেখে হালাল রিযিক দ্বারা জীবন বাসনা পূরণ করা যাচ্ছে না, তখন সে নাজায়েয তরীকায় পয়সা কামানো শুরু করে। খবরদার! এটা একটা হক। স্ত্রীর যে সকল হক বা কর্তব্য আছে স্বামীর ব্যাপারে, তা ইসলামী বিবাহ কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটা যে, স্বামীর প্রতি চাপ সৃষ্টি করা কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নেই। স্বামীর কোন মাল তার অনুমতি ছাড়া ব্যয় করাও স্ত্রীর জন্য জায়েয নেই। এভাবে রিযিক যেন হালাল থাকে, তার প্রতি বেশী খেয়াল রাখতে হবে। এ ব্যাপারে স্বামীকেও সহযোগিতা করতে হবে- যাতে সে আখিরাতকে বরবাদ করে দুনিয়ার আয়েশের দিকে না যায়।

জীবিকা উপার্জনের বৈধ পন্থা

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

আয়াতের তরজমা: "তোমরা অন্যায়ভাবে অবৈধ পন্থায় একে অপরের ধন-সম্পদ গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে বুঝে বাতিল পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসকদের হাতে তুলে দিও না।" (বাকারা-১৮৮)

শানে নুযূল : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি জমি নিয়ে বিবাদ হয়। পরিশেষে তারা এর মীমাংসার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে বাদী পক্ষের কোন সাক্ষী ছিল না। ফলে শরয়ী বিধান অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাদী পক্ষকে আল্লাহর নামে শপথ করতে বললেন (অর্থাৎ বিবাদী বলবে, আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, এই ভূমি আমার মালিকানা, বাদী পক্ষ এর মালিক নয়) তার শপথের পূর্বেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শুনিয়ে দিলেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে এই, "যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অঙ্গীকার করে শপথ করার মাধ্যমে পার্থিব সামান্য বস্তু ক্রয় করে, তাদের পরিণতি হলো আখিরাতে তাদের নেকীর কোনই অংশ নেই, আল্লাহ পাক তাদের সাথে কথাও বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আর তাদেরকে গুনাহ থেকেও পবিত্র করবেন না। এবং তাদের জন্য অপেক্ষমাণ থাকবে, ভয়াবহ কঠিন আযাব"। (সূরা আলে ইমরান-৭৭)

এই ভয়ংকর বিধান সম্বলিত আয়াত কর্ণগোচর হওয়াতেই সে বিবাদী মিথ্যা শপথ করা হতে বিরত থাকল। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদীপক্ষকে জমি হস্তান্তর করলেন।

প্রিয় নবী গাইব বা অদৃশ্য বিষয়ে জানতেন না

উক্ত আয়াত থেকে যেসব বিষয় প্রমাণিত হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাইব জানতেন না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জানানো ব্যতিরেকে অদৃশ্যের কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁর ইলম ছিল না। এটা একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের একক বৈশিষ্ট্য। শুধু উক্ত আয়াতেই নয়, বরং বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত। তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুবারক জীবনের শত-সহস্র ঘটনাও এর জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে। সকল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজস্ব ভাবে কোন গাইব জানতেন না। তবে গায়েবের অনেক খবর আল্লাহ তা'আলা তঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেয়ার পর তা আর নিজ থেকে গাইব জানা হয় না। যারা এতে দ্বিমত পোষণ করে তাদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাইব জানতেন না বলেই তিনি নিজ থেকে উল্লেখিত বিষয়ের কোন ফয়সালা দিতে পারলেন না। বরং শরয়ী বিধান অনুযায়ীই ফয়সালা দিলেন। যদি তিনি গাইব জানতেন, তাহলে উভয় পক্ষের যে সত্যবাদী তাকেই নির্দ্বিধায় উক্ত জমি দিয়ে দিতেন, আর অপর পক্ষকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতেন। সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাসও এটা ছিল

যে, তিনি গাইব জানতেন না। অন্যথায় তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শরয়ী ফয়সালার জন্য আসতেন না এবং গাইবী ইলম দ্বারা মূল মালিককে সম্পদ হস্তান্তর করার সুপারিশ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গাইব জানতেন না, তাহলে অন্য কোন পীর-বুযুর্গের বা জ্বীনদের গাইব জানার প্রশ্নই উঠে না। কেউ দাবী করলে সে মিথ্যুক হবে। আর কেউ বিশ্বাস করলে তার ঈমান নষ্ট হবে।

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহপাক বান্দাদেরকে অবৈধ ও বাতিল পন্থায় ধন-সম্পদ উপার্জন করে ভোগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ এ অলঙ্ঘনীয় বিধানকে অমান্য করে, তার পরিণতি কি হবে সেটারও বিবরণ দিয়েছেন। এ আয়াতের পূর্বে রমাযানের রোযার আলোচনা চলছিল,উভয় আয়াতের মধ্যে সমঞ্জস্য হলোঃ

(১) যদি কেউ এ অভিলাষ রাখে যে, তার বহু কষ্টের রোযা, ইফতার, সাহরী, তারাবীহ ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে কবূল হোক, তাহলে তার জন্য জরুরী হলো হারাম ও অবৈধ পন্থায় মাল উপার্জন থেকে বিরত থাকা এবং রোযার মাসে হালাল মাল ভক্ষণ করা। কেননা, হারাম রিযিক ভক্ষণ করলে ইবাদতই কবূল হয় না।

পবিত্র রমযানে শিক্ষা

(২) রমাযান মাসে সীমিত কিছু বস্তুকে সাময়িকের তরে বান্দার জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন খানা-পিনা, স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি। এসবই মূলতঃ হালাল, কিন্তু রমাযান মাসের দিনের বেলা এসবই হারাম। অর্থাৎ মুমিনদের উপর সীমিত কয়েকটি বস্তুকে ক্ষণিকের জন্য হারাম করে দিয়ে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে বলেছেন যে, রমাযানের পর সর্বদার জন্য হারাম বস্তু থেকে স্থায়ীভাবে বিরত থাকবে। এটাই পবিত্র রমাযানের শিক্ষা।

আয়াতদ্বয়ের সম্পর্কঃ বাস্তবিক পক্ষেই উভয় আয়াতের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। একটি আরেকটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মত। শুধু কি তাই? হারাম ও অবৈধ মাল থেকে বেঁচে থাকা মহান আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় বিধানও বটে। উক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ পাক অপর ভাই এর সম্পদকে তোমাদের মাল বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপরের সম্পদ বলা যুক্তি সংগত ছিল। মুফাসসিরগণ এর হিকমত উল্লেখ করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হে ঈমানদারগণ! তোমরা অপরের সম্পদকে নিজের সম্পদের মতই মনে কর। কেননা, তাতো তোমার অপর এক মুসলমান ভাইয়েরই। যেমনিভাবে তোমরা নিজের সম্পদকে অত্যাধিক গুরুত্বের সাথে হেফাযত করে থাকো, কোনক্রমেই তা নষ্ট হতে দাও না, তোমার সম্পদ অন্য কেউ অবৈধভাবে উপভোগ করলে তোমরা কষ্ট লাগে, তেমনিভাবে অপরের সম্পদকেও অত্যাধিক গুরুত্বের সাথে

হেফাযত করবে, তাকে কোনভাবেই তোমার সামনে বিনষ্ট হতে দিবে না। কেননা, সেও তো তোমার একজন মুসলমান ভাই। অন্য কেউ তার সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করলে তোমার মত তারও তো কষ্ট লাগবে। সুতরাং অন্য ভাইয়ের সম্পদ তুমি অবৈধ পন্থায় ভোগ করতে যেয়ো না। তাছাড়া অপর ভাইয়ের ধন-সম্পদ ক্ষতি করা, আত্মসাৎ করা, নিজের ধন-সম্পদ নষ্ট করার মতই। সুতরাং তুমি অন্যের সম্পদ ধোঁকা বা ফাঁকি দিয়ে আত্মসাত করলে একথা বিশ্বাস করে নাও যে, ভবিষ্যতে তোমার থেকেও অন্য কেউ ঐ পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী টাকা অবৈধভাবে উসূল করতে পারে বা অসুখ-বিসুখে ঐ টাকা অহেতুক খরচ হয়ে যাবেই। আর অশান্তি তো বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। আজ যদি তুমি মালে ভেজাল মিশ্রিত করে বিক্রি কর, তবে জেনে রাখো, অন্য একদিন তোমাকে দিয়ে আল্লাহ পাক ভেজাল বস্তু খরিদ করাবেন। তুমি ক্রেতাকে ঠকালে অন্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা তোমাকে ঠকাবেই। এটাই পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়ম। তুমি কাউকে ক্ষতি করো না, আল্লাহ পাক তোমার ক্ষতি করবেন না।

হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করা

উল্লেখ্য, মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো জীবিকা উপার্জন করা। কারণ, মানুষকে এ ধরাধামে প্রাণে বেঁচে থাকতে হলে তার জীবিকা উপার্জন করা অপরিহার্য। এ জন্য যার হালাল রিযিকের ব্যবস্থা নাই, তার জন্য ফরয ইবাদতের পর হালাল রিযিকের জন্য চেষ্টা-তদবির করা ফরয। আল্লাহপাক এ ভূ-পৃষ্ঠে জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রেখেছেন। তন্মধ্যে প্রধানত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃষি, চাকুরী ও ব্যবসা। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে ইসলামী বিধান রয়েছে এবং এ সম্পর্কে ফিকাহের কিতাবে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন পদ্ধতি কিভাবে অবলম্বন করতে হবে, কোন পন্থায় তা করলে হালাল হবে, কোন পন্থা অবলম্বন করলে হারাম বা অবৈধ হবে, এর প্রত্যেকের জন্য তার জীবিকা অর্জনের লাইনে মাসআলা জেনে নেয়া ফরয এবং এটা ইসলামের মৌলিক পাঁচ বিষয় এর একটি, যথা ঈমান, ইবাদত, হালাল রিযিক, বান্দার হক, আত্মশুদ্ধি, এর অন্যতম একটি বিষয়। কারণ, রিযিক, হারাম বলে অন্যান্য ইবাদত কবূল হয় না। ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করলেই তা হালাল হয় না। বরং সাথে সাথে তা ইসলামী শরী'আত অনুযায়ীও হতে হবে। শরী'আতের বিধান লঙ্ঘন করে মানুষ যত কষ্ট করেই অর্থোপার্জন করুক না কেন, তা হারাম ও অবৈধ হবে।

চাকুরীর বৈধতার শর্তসমূহ

চাকুরী করে অর্থাৎ শ্রম ও সময় দিয়ে অর্থোপার্জন করা জায়েয। কিন্তু এর বৈধতার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন এমন কোন সংস্থায় চাকুরী নেয়া যাবে না, যার উদ্দেশ্যই হল ইসলাম ও মুসলমানদের মূলোৎপাটন করা। যেমন,

খৃষ্টান মিশনারিদের কোন সংস্থায় বা তাদের মদদপুষ্ট কোন সংস্থায় চাকুরী করা, যাদের পরম ও চরম উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নির্মূল করা এবং তাদেরকে খৃষ্টান, বে-ঈমান বানানো। তাদের সংস্থায় চাকুরী নেয়া মানে পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বা সুদী ব্যাংকে বা বীমা ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকুরী করা জায়েয নেই, বরং তা হারাম। তার উপার্জিত অর্থও হারাম ও অবৈধ। কেননা, এতে সুদকে ব্যাপকভাবে প্রসার করতে সাহায্য করা হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

لَعن رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء

সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেন-দেনের লেখক (কেরানী) এবং এর উপর সাক্ষ্যদাতা সবার উপরই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন, এবং বলেছেন যে, তারা সবাই গুনাহের দিক দিয়ে সমান পর্যায়ের। (মুসলিম শরীফ হাঃ ১৫৯৮)

এজন্যে চাকুরী নেয়ার পূর্বেই মাসআলা জেনে নেয়া উচিৎ। জেনে বুঝে অবৈধ চাকুরী নেয়া মানে আল্লাহ পাকের সাথে সরাসরি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। এটা প্রাণ থাকতে একজন মুমিনের জন্য কস্মিনকালেও সম্ভব হতে পারে না এবং যারা মাসআলা জানার পূর্বেই সুদী কারবার বা সুদী ব্যাংকে চাকুরী নিয়ে ফেলেছেন, তাদের জন্য শরী'আতের বিধান হলো, তারা রাতারাতি চাকুরী ছেড়ে দিবে না। কারণ, তখন অভাবের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং সেক্ষেত্রে ঈমানের উপর ঝুঁকি আসতে পারে। বরং ইস্তিগফারের সাথে উক্ত চাকুরী করতে থাকবে এবং হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে হারাম চাকুরী ছেড়ে দিবে। মোদ্দা কথা, হারাম চাকুরীরত অবস্থায় কোন হালাল পন্থা অন্বেষণ করতে থাকবে এবং মহান আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করতে থাকবে। তেমনিভাবে হারাম মাল উৎপাদন বা বেচাকেনা হয় এমন প্রতিষ্ঠানেও চাকুরী নিবে না। ডিউটির সময়ের মধ্যে ফাঁকি দিবে না। কাজের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ যে বেতন ভাতা দিবে সেটাই হালাল। জনসাধারণ থেকে বখশিশ বা অন্য নামে অর্থ গ্রহণকে হারাম মনে করবে। প্রতিষ্ঠানের কাগজ, কলম, খাম, প্যাড ইত্যাদি যত জিনিস আছে এগুলোও নিজের কাজে ব্যবহার অবৈধ মনে করবে।

ইসলামী ব্যবসানীতি

তেমনিভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করাও বৈধ। কিন্তু তার জন্য শর্ত হলো, সে ব্যবসা বৈধ পন্থায় হতে হবে। যে সকল ক্ষেত্রকে শরী'আত বাতিল ও হারাম ঘোষণা করেছে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য হালাল হওয়ার জন্য বহু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করা হল, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষই জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে, সুতরাং পাগল বা অবুঝ শিশুদের

ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তাদের উভয়ের আন্তরিক সম্মতিক্রমে ‘প্রস্তাব ও গ্রহণ’ অনুষ্ঠিত হতে হবে। দ্রব্য এবং মূল্য উভয়টাই ইসলামী দৃষ্টিতে হালাল হতে হবে। যদি দ্রব্য শরী‘আতের দৃষ্টিতে মালে হালাল না হয় যেমন মৃত জানোয়ার, মদ, গাঁজা, হিরোইন, শুকর ইত্যাদি তাহলে তা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই।

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পণ্য উপস্থিত ও দৃশ্যমান হতে হবে এবং তা ক্রেতার হাতে হস্তান্তর করার উপর বিক্রেতার ক্ষমতা থাকতে হবে। পুকুরের পানিতে মাছ বিক্রি করা জায়েয নেই কেননা, বিক্রিয় সময় সেগুলো দৃশ্যমান থাকে না, বরং পুকুর থেকে তুলে বিক্রি করতে হবে। তেমনিভাবে এমন বস্তু বিক্রি করল যা অন্যের মালিকানায়, তাও নাজায়েয। কেননা,তা ক্রেতার হাতে তুলে দিতে পারবে না। হ্যাঁ যদি সে ব্যক্তি তাকে অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে জায়েয হবে। তেমনিভাবে এমন বিক্রেতার নিকট থেকে দ্রব্য ক্রয় করা যাবে না, যাকে প্রথম-বিক্রেতাই মাল বুঝিয়ে দেয়নি বা হস্তান্তর করেনি। এ ধরনের বেচা কেনাও জায়েয নয়। মাল হাতে আসার পূর্বে বেচা নিষেধ। শরী‘আতের এ বিধান না মানার কারণেই বিদেশ থেকে আমদানীকৃত মালের ডকুমেন্টটি বাংলাদেশে পৌঁছার পূর্বেই একের পর এক এভাবে কয়েকজনের হাতে বিক্রি হয়ে যায়। অথচ কোন বিক্রেতাই ক্রেতাকে মাল বুঝিয়ে দেয় না, এ ভাবে প্রত্যেকে লাভ নিয়ে অন্যের কাছে ডকুমেন্টের কাগজটা বিক্রি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যিনি মাল খালাস করে নেন, তার পূর্বে কয়েকজন লাভ করার দরুন তার ক্রয়মূল্য অনেক গুণ বেশী পড়ে, তখন সে অনেক বেশী দামে বেঁচতে বাধ্য হয়। যার খেসারত জনগণকে দিতে হয়। এভাবে জনগণ চরম দ্রব্যমূল্য ও অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে জাতির উপর এ মুসীবত পতিত হয়। সুতরাং এমন ক্রয়-বিক্রয় ইসলাম বৈধ করে নাই। তাছাড়া দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্যে মালের সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়া, মাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল দেয়া, ধোঁকা দেয়া, ভালো মাল দেখিয়ে মন্দ মাল দেয়া ইত্যাদি সবই নাজায়েয ও হারাম। আশরাফুল মাখলূকাতকে কষ্ট দেয়ার কারণে এতে মালে বরকত তো হবেই না বরং অবনতি হতে থাকবে আর আখিরাতের আযাব তো আছেই। যদিও বাহ্যত: মাল বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

শেয়ার ও বর্তমান শেয়ার বাজার

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: (অর্থ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার করো, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দিয়েছি। (সূরা বাকারাহ-১৭২)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: (অর্থ) মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন সম্পদ উপার্জনে এ মর্মে কোনো তোয়াক্কা করবে না যে, সে হালাল উপার্জন করছে, নাকি হারাম উপার্জন করছে। (সহীহ বুখারী হা. নং ২০৫১)

৩. অন্যত্র ইরশাদ করেন: (অর্থ) হারাম খাদ্যে লালিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বাইহাকী হা. নং ৫৭৫৯)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন: (অর্থ) হালাল ও হারামের বিষয় তো স্পষ্ট। তবে এ দু'য়ের মাঝে কতিপয় সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে, যেগুলো সর্ম্পকে বহু লোক অবহিত না। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বিরত থাকে সে নিজ দ্বীন ও মর্যাদার হেফাযত করতে পারে। আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয় সে পর্যায়ক্রমে হারামে পতিত হয়। (সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নং ২০৫১, সহীহ মুসলিম শরীফ হা. নং.১৫৯৯)

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য রুযী-রোযগার হালাল হওয়া আবশ্যক। স্পষ্ট হারাম থেকে বাঁচা যেমন জরুরী তেমনি শর'ঈ প্রমাণের ভিত্তিতে হারামের সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বিরত থাকা জরুরী।

যারা কুরআন, হাদীস ও পরকাল বিশ্বাস করে না দুনিয়ার জীবনে হয়তো তারা হারাম বা সন্দেহযুক্ত রুযী-রোযগার বর্জনের কষ্টটুকু স্বীকার করবে না; কিন্তু কোনো মুসলমান ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রাচুর্যের লোভে চিরস্থায়ী আখিরাতকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে না, বরং অসীম জীবনের সুখ-সাফল্যের লক্ষ্যে সীমিত সময়কে পূর্ণ সংযমের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে সচেষ্ট হবে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় আয়-উপার্জনেও হারাম তো বটেই, সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও থাকবে নিরাপদ দূরত্বে। বর্তমান যামানায় আয়-উপার্জনের একটি মাধ্যম হলো শেয়ার বেচা-কেনা। অথচ শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এতে রয়েছে হারাম ও নাজায়িযের ব্যাপক সম্পৃক্ততা যা থেকে বাঁচতে হলে তা জানতে হবে খুব গভীরভাবে। আর এজন্যই আমাদের নিম্নোক্ত প্রয়াস।

শেয়ারের শর'ঈ বিশ্লেষণ

বর্তমানে শেয়ারসমূহের রয়েছে দ্বিমুখী সংশ্লিষ্টতা
(ক) কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্টতা ও (খ) শেয়ারবাজার বা পুঁজি বাজারের সাথে সংশ্লিষ্টতা।

কোম্পানি বার্ষিক যে লভ্যাংশ ঘোষণা করে তা শেয়ার-হোল্ডারের একাউন্টে জমা হয়ে যায়, তেমনি কোম্পানি যদি লভ্যাংশের পরিবর্তে বোনাস শেয়ার প্রদান করে তাও শেয়ারধারীর বি.ও তে জমা হয়, কিংবা রাইট-শেয়ার নিতে চাইলে সে-ই প্রাধান্য পায়। আর ভবিষ্যতে কখনো কোম্পানি বিলুপ্ত হলে শেয়ার-হোল্ডারগণ শেয়ার অনুপাতে সকল সম্পদে অংশীদার হয়। এসকল বিষয়ের বিবেচনায় প্রতিটি শেয়ার মানে কোম্পানির সকল সম্পদে আনুপাতিক অংশীদারিত্ব।

পক্ষান্তরে বর্তমান শেয়ার বাজারে শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে প্রায় স্বতন্ত্র। এখানে শেয়ারের মূল্যায়ন ভিন্নভাবে হয়। দেশের আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গ্রাহকদের চাহিদা বা অনীহা এসব বিষয়ের প্রভাব শেয়ারের ক্ষেত্রে এক রকম, আর কোম্পানির ক্ষেত্রে আরেক রকম। কোম্পানির লাভ-লোকসানের সাথে শেয়ার-মূল্যের উত্থান বা পতনের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। শেয়ারবাজারে যারা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে তাদের অধিকাংশের ধারণায়ও একথা থাকে না যে, সে কোম্পানির আনুপাতিক অংশের ক্রয়-বিক্রয় করছে। এ সকল দিক বিবেচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ারের বাস্তবতা হলো শুধু সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার সংখ্যা। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

শেয়ারের মূল্য:

শেয়ারের মূল্য তিন ধরনের হয়ে থাকে
(ক) গায়ের দর (Face value): অর্থাৎ শেয়ারের প্রথম নির্ধারিত মূল্য।
(খ) বাজার দর (Market value): অর্থাৎ শেয়ারবাজারে যে দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।
(গ) বাস্তব দর (Neet Asset value/Break up value): অর্থাৎ কোম্পানি বিলুপ্ত হলে প্রতি শেয়ার হোল্ডার যা পাবে।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর'ঈ বিধান:

(ক) শরীয়তমতে কোনো বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হতে হলে তা মাল তথা সম্পদ হওয়া আবশ্যক। আর মাল বা সম্পদ বলা হয় যা ব্যবহারযোগ্য হয়, এবং যার নিজস্ব মূল্য আছে। (ফিকহী মাকালাতঃ ১ম খণ্ড, বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাঃ ১ম খণ্ড) একথা অনস্বীকার্য যে, শর'ঈ সংজ্ঞা মতে শেয়ার-সার্টিফিকেট মাল নয়। বরং মাল হলো কোম্পানীস্থিত অর্থ-সম্পদের আনুপাতিক অংশ। কাজেই শেয়ার কেবল তখনই বেচা-কেনার যোগ্য হবে, যখন তা কোম্পানীস্থিত অর্থ-সম্পদের আনুপাতিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। যদি কোম্পানির অর্থ-সম্পদের সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এসে যায় তখন শর'ঈ দৃষ্টিতে তা ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য থাকবে না।

(খ) ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো হারাম কিংবা হারাম যুক্ত না হওয়া। কাজেই কোনো কোম্পানির মূল কারবার যদি হারাম হয়, যেমন মদ বা মাদক জাতীয় বস্তুর উৎপাদন বা ব্যবসা, অনুরূপ প্রচলিত ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি, যাদের মূল কারবার হয় সুদের উপর অর্থ লগ্নি করা, এধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তমতে বৈধ নয়।

(গ) গায়ের দরের চেয়ে কম-বেশিতে শেয়ার লেন-দেন করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো কোম্পানির 'স্থির সম্পদ' (Fixed Assets) থাকা। কাজেই যে সকল কোম্পানি 'স্থির' পণ্যের মালিক হয়নি সেগুলোর শেয়ার গায়ের দরের চেয়ে কম-বেশিতে লেনদেন শরীয়তমতে জায়িয নয়।

(ঘ) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফটকাবাজী, প্রতারণা ও জুয়ামুক্ত হওয়াও জরুরী। অন্যথায় এর দ্বারা যে আয় হবে তা হালাল হবে না।

মোটকথা, সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা-নির্ভর, স্থির সম্পদ-সমৃদ্ধ, ফটকাবাজী ও জুয়া-মুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়া এবং পরবর্তীতে আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয আছে।

সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের হুকুম:

আজকাল একশত ভাগ হালাল কারবার করে, প্রাসঙ্গিক পর্যায়েও হারাম ও নাজায়িয লেনদেন করে না, এমন কোম্পানির অস্থিত্ব না থাকার মতই। বিশেষ করে ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ নেওয়া ও ব্যাংক থেকে সুদী লোন নিয়ে ব্যবসায় লাগানোর কাজটি প্রায় সব কোম্পানীই করে থাকে। প্রশ্ন হলো এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়া জায়িয আছে কি না?

ইসলামী অর্থনীতি ও লেনদেনের মাসায়িল সম্পর্কে বিজ্ঞ কিছুসংখ্যক আলিমের মতে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এজাতীয় কোম্পানির শেয়ার কেনা জায়িয হতে পারে।

শর্তগুলো যথাক্রমে:

(ক) কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) কিংবা যে কোনো উপায়ে নীতি-নির্ধারকদের নিকটে একজন শেয়ার-হোল্ডার হিসাবে সুদী লেনদেনের বিপথে প্রতিবাদ পাঠাবে। তার প্রতিবাদ কার্যকর না হলেও যেহেতু সে নীতিনির্ধারক বা পরিচালক নয়, কাজেই এ প্রতিবাদের পর সুদী লেনদেনের দায় তার উপর বর্তাবে না।

(খ) যদি কোম্পানি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ তার শেয়ার-হোল্ডারদের মাঝে বণ্টিত লভ্যাংশের মধ্যে শামিল করে তাহলে কোম্পানির 'ব্যালেন্সশীট' তথা আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখে সুদের আনুপাতিক অংশটুকু সাওয়াবের নিয়ত না করে সদকা করে দিবে।

(গ) যারা লভ্যাংশের জন্য নয়, বরং শেয়ার দিয়ে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে কিংবা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ব্রোকারী করে, তারাও আয়ের একটা অংশ অনুমান করে সদকা করে দিবে।

পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি ও লেনদেনের মাসায়িল সম্পর্কে বিজ্ঞ বিশ্বের অধিকাংশ আলিমের মত হলো, সুদের মতো জঘন্য পাপের ক্ষুদ্রতম দায় বর্তায় এমন কাজও বিনা ঠেকায় কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না। কাজেই মূল ব্যবসা হালাল হওয়া সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে সুদী লেন-দেন করে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। প্রতিবাদ করলে কোনো কাজ হবে না জেনেও স্বেচ্ছায় তাতে অংশীদার হওয়া, অতঃপর এ ঠুনকো প্রতিবাদ করা তাতে সুদের দায় এড়ানো যাবে না। কোম্পানির সুদী লোনের পরিমাণ কম-বেশি হওয়া এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। অনুরূপ এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়াকে এজাতীয় কোম্পানির পণ্য ক্রয় করার সাথে তুলনা করাও ঠিক হবে না। সুদী লেন-দেনের বর্তমান ব্যাপকতাও এক্ষেত্রে অজুহাত হতে পারে না, যেমন বর্তমানে সুদের মারাত্মক ব্যাপকতা সত্ত্বেও সুদের কোনো অংশ বৈধ নয়।

বর্তমান শেয়ার বাজারের শরঈ বিধান:

বর্তমান শেয়ারবাজার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেখানে শুধু Capital Gain তথা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করা হয় (যদিও কখনো লোকসানও গুনতে হয়), কোম্পানিতে অংশীদার হয়ে লভ্যাংশ (Divident) গ্রহণ মূল উদ্দেশ্য নয়; যদিও কখনো দাম বাড়ার অপেক্ষা করতে হয়। এ বাজারকে Secondary Market (সেকেন্ডারি মার্কেট), Money Market (মানি মার্কেট), Capital Market (ক্যাপিটাল মার্কেট) ও বলা হয়। এ বাজারে শেয়ারের লেন-দেন হয় স্বতন্ত্র গতিতে। কোম্পানি-ঘোষিত 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু' তথা শেয়ারের বাস্তব মূল্যের সাথে এবং কোম্পানির বাস্তব অবস্থার সাথে শেয়ার বাজারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক একেবারে গৌণ।

এ বাজারের শেয়ার আর কোম্পানিতে আনুপাতিক অংশীদারিত্ব মোটেও এক জিনিষ নয়। অথচ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার মূল ভিত্তিই ছিল এ কথার উপর যে, শেয়ার মূলত কোম্পানির সকল সম্পদের আনুপাতিক মালিকানা। শুধু কাগজ বা সংখ্যা হলে তার ব্যবসা জায়িয হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা তখন সে ব্যবসার অর্থ হবে টাকার বিনিময়ে টাকার ব্যবসা। তাছাড়া কিছুসংখ্যক ফিকাহবিদের মতে প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে সুদী কারবারে জড়িত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হওয়ার জন্য সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে শর্ত রাখা হয়েছে, শেয়ার ব্যবসায়ীদের জন্য সে শর্তটি পালন করাও সম্ভব নয়। কারণ, তারা কখনো দিনেই কয়েকবার বেচাকেনা করে আবার একসঙ্গে বহু কোম্পানির শেয়ার লেন-দেন করে। এ অবস্থায় তারা কতবার সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে? কার কাছেই বা প্রতিবাদ করবে? আর যদি প্রতিবাদ করেও, তা কি হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না?

সুতরাং বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় (Capital Gain) করে অর্থোপার্জন এক ধরণের জুয়া যা কোনো সূরতেই জায়িযের আওতায় পড়ে না এবং উপরোক্ত পদ্ধতিতে শেয়ার-ব্যবসা করাকে কোনো নির্ভরযোগ্য আলিম বৈধ বলেছেন বলেও আমাদের জানা নেই।

যারা শেয়ার-ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে শরী'আতের হুকুম কী?

বলা বাহুল্য যে, শর'ঈ মাসআলা সম্পর্কে অবগত না হয়ে লাখ লাখ মুসলমান এমনকি অনেক দ্বীনদার লোকেরাও এযাবৎ এ ব্যবসায় জড়িত হয়েছেন এবং অনেকেই এ ফটকাবাজী ব্যবসার স্বাভাবিক পরিণতিও বরণ করেছেন। এ

পর্যায়ে কেউ কেউ ভবিষ্যতে কখনো এ ব্যবসা না করার সংকল্প করেছেন; কারো কারো কিছু শেয়ার অবশিষ্টও রয়ে গেছে। এদের ক্ষেত্রে শর'ঈ হুকুম কী?

এ প্রশ্নের উত্তর জানার আগে একটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হলো, একজন লোক বিপদে জড়িয়ে পড়ার পর তা থেকে মুক্ত হতে চায়, আরেকজন ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় সেই বিপদে জড়াতে চায়। দু'জনের হুকুমে ক্ষেত্র বিশেষে একটু পার্থক্য হয়। কাজেই নতুন করে এ ব্যবসা শুরু করা, বা পুরাতন ব্যবসায়ীর জন্য এতে জুড়ে থাকা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তো নির্ধারিত। সুদের অংশ সদকা করবেন এ নিয়তেও তাদের জন্য এ ব্যবসায় প্রবেশ করা জায়িয হবে না। কিন্তু যারা হালাল পণ্য উৎপাদনকারী বা বৈধ পণ্যের ব্যবসা করে এমন কোম্পানির প্রাইমারী বা সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে ইতিপূর্বে আয় করেছেন, তারা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহের বিগত দিনের 'ব্যালেন্সশীট' দেখে নিবেন। ব্যালেন্সশীটে আয়ের মধ্যে যদি সুদের অংশ উল্লেখ থাকে তাহলে সে অংশ অনুপাতে, বরং সতর্কতামূলক কিছু বেশি টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবেন। অনুরূপভাবে শেয়ারবাজার যখন জুয়াড়িদের ষড়যন্ত্র, বা 'মার্চেন্ট ব্যাংক' সমূহের অতিমাত্রিক লোনের প্রভাবে কৃত্রিমতায় ভাসছিল তখন যারা রাতারাতি লাখ লাখ টাকা বানিয়েছেন তারাও কোম্পানির বাস্তব অবস্থার সাথে তুলনা করে অস্বাভাবিক আয়টুকু সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবেন। আর যাদের নিকট এখনো কোনো কোম্পানির শেয়ার বিদ্যমান আছে তারা তাদের শেয়ারের বাজার-মূল্য কোম্পানির 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু'র সমপরিমাণ হলেই বিক্রয় করে এ ব্যবসা থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়বেন। এতে যদি আর্থিক ক্ষতি হয় তাহলে পরকালের কথা ভেবে সেই ক্ষতি মেনে নিবেন।

আর যারা ব্যাংক-বীমা ও হারাম কারবারে জড়িত কোম্পানির শেয়ার দ্বারা ব্যবসা করেছেন তাদের তো সম্পূর্ণ আয়ই সদকা করে দেওয়া জরুরী। এক সাথে সম্ভব না হলে আস্তে আস্তে সদকা করতে থাকবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকলেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাঁটি মনে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে নিজ অপার কৃপায় ক্ষমা করুন। আমীন।

ব্যাংক ডিপোজিটের প্রকারভেদ ও তার শরয়ী বিধান

ব্যাংকিং পরিভাষায় ব্যাংক ডিপোজিট চার প্রকার:

১. কারেন্ট একাউন্ট (Current Account) বা চলতি হিসাব।

২. সেভিংস একাউন্ট (Savings Account) বা সঞ্চয়ী হিসাব।
৩. ফিক্সড একাউন্ট (Fixed Deposit) বা নির্ধারিত মেয়াদি সঞ্চয়।
৪.লকার (Locker) তথা ব্যাংক থেকে লোহার বক্স ভাড়া নিয়ে তাতে টাকা পয়সা বা মূল্যবান সামগ্রী রেখে তা ব্যাংকের নিকট আমানত রাখা। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৩-১৫)

ব্যাংক ডিপোজিটগুলোর শরয়ী অবস্থান:
প্রথম তিন প্রকার করজের হুকুমে দুটি শর্তের কারণে:

এক. এই তিন প্রকারের (কারেন্ট, সেভিংস ও ফিক্সড) ডিপোজিটারগণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে তাদের অর্থের যামিন বা জিম্মাদার বানায়।
দুই. ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে তাদের গচ্ছিত অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহারের সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করে থাকে।
চতুর্থ প্রকার তথা লকার (Locker) এটা বর্তমান প্রচলন ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ উভয় বিবেচনায় আমানত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৮)

সাধারণ ব্যাংকগুলোতে অর্থ রাখার শরয়ী হুকুম:
১. জান ও মালের নিরাপত্তার খাতিরে কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখা জায়িয আছে। যেহেতু কারেন্ট একাউন্ট হোল্ডারদেরকে ব্যাংক কর্তৃক কোন মুনাফা প্রদান করা হয় না। বরং তাদের থেকে উল্টা সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য চার্জ কাটা হয়। অতএব, কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখলে সুদি লেন-দেনে অংশগ্রহণ গণ্য হবে না। সুতরাং তা জায়িয আছে।

২.ফিক্সড ডিপোজিট ও সেভিংস একাউন্টে টাকা রাখা জায়িয নেই। কারণ এই উভয় প্রকার একাউন্ট হোল্ডারদেরকে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফা প্রদান করা হয় এবং এই উভয় একাউন্টে গচ্ছিত টাকা উম্মতের ঐক্যমতে করজের হুকুমে। আর করজের বিনিময়ে লাভ হাসিল করা শরীয়তে সূদ। অতএব ব্যাংক একাউন্ট হোল্ডারদেরকে মূল টাকার অতিরিক্ত যে টাকাই প্রদান করবে তা স্পষ্ট সূদ হবে। আর সূদ বৈধ হওয়ার কোন সুরত নেই।

সুতরাং যে ব্যক্তি উল্লেখিত একাউন্টে টাকা রাখবে সে ব্যাংকের সাথে হারাম লেন-দেনে শরীক হয়ে যাবে। এ কারণে কোন মুসলমানের জন্য এই দুই প্রকার (সেভিংস এবং ফিক্সড ডিপোজিট) একাউন্টে টাকা রাখা জায়িয নেই । কেউ রেখে থাকলে সুযোগ থাকলে সে একাউন্ট পরিবর্তন করে চলতি হিসাব খুলে সেখানে টাকা রাখবে। আর যদি কোন কারণে চলতি হিসাব খুলতে অপারগ হয়

এবং জান ও মালের নিরাপত্তার জন্য সেভিংস একাউন্ট খুলতে বা জারী রাখতে বাধ্য হয়, তাহলে সে ইস্তিগফার করতে থাকবে এবং ঐ একাউন্টে যে সূদ আসবে তা সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া মিসকিনদেরকে বা মসজিদ মাদরাসার বাথরুম নির্মাণের জন্য (কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে) দিয়ে দিবে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর হুকুম:

ইসলামী ব্যাংক একটি মহত উদ্যোগ। উদ্যোক্তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। যদি এটিকে তারা পূর্ণ ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করেন। যার জন্য জরুরী হলো;

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এই মর্মে অনুমতি না নিয়ে থাকলে অনুমতি নিবে যে, ব্যাংক সরাসরি নিজে বাণিজ্যিক মাল আমদানি ও রপ্তানি করবে।

(খ) প্রত্যেক শাখার কারবার প্রত্যক্ষ করার জন্য একজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন থাকবে এবং সর্বময় কর্তৃত্ব ম্যানেজারের নয়, মজলিসে শূরার হাতে থাকবে। (ইসলাম আওড় জাদীদ মায়ীশাত পৃ. ১২৬)

১. ইসলামী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট সাধারণ ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের মত জায়িয আছে।

২. ইসলামী ব্যাংকগুলো সেভিংস এবং ফিক্সড ডিপোজিটারদের সাথে টাকা বিনিয়োগের বিভিন্ন ব্যবসায়িক খাত দেখিয়ে যে চুক্তি করে থাকে তাকে শরিয়তের পরিভাষায় আকদে মুযারাবাহ বলে। আর ডিপোজিটারদের পরস্পরের মাঝে হয় আকদে মুশারাকাহ বা অংশীদারিত্বের চুক্তি। যারা সকলে মিলে তাদের অর্থ ও শ্রম ব্যাংকের নিকট সোপর্দ করেছে লাভ-লোকসানের মধ্যে শরীক হওয়ার ভিত্তিতে। ব্যাংক তাদেরকে নির্দিষ্ট পার্সেন্টিস হিসেবে লাভ দিবে। আর ক্ষতি হলে মুনাফা দ্বারা তা পূরণ করা সম্ভব না হলে ডিপোজিটারকেও তার অংশ অনুপাতে লোকসানের বোঝা নিতে হবে। বাস্তবে এমনটি হলে তা জায়িয হবে। কিন্তু সরেজমিনে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, ইসলামী ব্যাংকগুলো সূদী ব্যাংকগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে সূদী লেন-দেনের সাথেই বেশী জড়িত। তারা মুখে মুখে হালাল মুনাফা প্রদানের কথা বললেও সহীহ তরীকায় ইনভেস্ট করে না তথা বেচা-কেনার মধ্যে শরীয়ত যে-সব শর্ত আরোপ করেছে তা সঠিকভাবে রক্ষা করে না। খাতা কলমে ঠিক দেখালেও বাস্তবে করে খামখেয়ালী এবং জনবল না থাকার দোহাই দিয়ে থাকে যা অগ্রহণযোগ্য।

তাই প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতেও সেভিংস এবং ফিক্সড ডিপোজিট একাউন্ট খোলা জায়িয হবে না। যতক্ষণ না তারা তাদের কার্যক্রম বাস্তব ক্ষেত্রেও শরয়ী পন্থায় নিয়ে আসে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাদের কার্যক্রম সম্পূর্ণ শরীয়ত ভিত্তিক প্রমাণ করতে না পারে। (আল মাবসূত লিস্ সারাখসী ২২/১৩৩)

অমুসলিম দেশের ব্যাংকের হুকুম:

অমুসলিম দেশের অমুসলিম মালিকদের ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় সূদ গ্রহণের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের সমর্থন রয়েছে। যেহেতু তারা এই টাকা মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদেরকে দুর্বল করার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে। কাজেই সূদের টাকা ব্যাংকে না ছেড়ে উঠিয়ে নিবে। তার পর সাওয়াবের নিয়ত না করে মিসকিনদেরকে দিয়ে দিবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/২২)

সূদী টাকার হুকুম:

যারা শরয়ী বিধান না জানার কারণে শরীয়ত বিরোধী পন্থায় লেন-দেন করার কারণে কিছু সূদী টাকা তার মালিকানায় চলে এসেছে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধি-বিধানের পাবন্দি ছিলনা। কিন্তু এখন সে তাওবা করে সূদ থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছে, তারা সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া ঐ টাকা ফকীর-মিসকিন অথবা কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে দিবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/২২)

শরী'আতের দৃষ্টিতে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসা

এম.এল.এম.তথা মাল্টিলেভেল মার্কেটিং এর পরিচয়:

বর্তমানে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং সম্পর্কে কম-বেশি অনেকেই জানে। তথাপি এ সম্পর্কে জরুরী কিছু ব্যাখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

"মাল্টি" অর্থ বহু, নানা। "লেভেল" অর্থ স্থর। "মার্কেটিং" অর্থ ক্রয়-বিক্রয়, বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য ছাড়া। একক শব্দগুলি একত্রিত করলে অর্থ দাড়ায়, অনেক স্থর বিশিষ্ট বিপণন। এই অর্থ থেকেই এই ব্যবসার হাকীকত বুঝে আসে। যেমন:

[ক] অনেক স্থর বিশিষ্ট বিপণন মানে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের পরই কারবার শেষ হয় না; বরং সামনে অনেক স্থরে এটি চলমান থাকবে।

[খ] এখানে দুটি পদবী একত্রে অর্জিত হয়। ১. ক্রেতা ২. পরিবেশক। দুনিয়ার অন্যান্য কারবারে কেনা শেষ হওয়ার পর একটি পদবী অর্জিত হয়, তা হল ক্রেতা, আর জিনিস ও একটিই অর্জিত হয়, তা হল পণ্য বা নির্ধারিত সেবা, কিন্তু এখানে পদবী দুটি জিনিসও দুটি। একটি হলো পণ্য, অপরটি ডিস্ট্রিবিউটরশীপ বা পরিবেশক হওয়ার যোগ্যতা। যেমন:আপনি ওদের থেকে একটি পানি বিশুদ্ধিকরণ মেশিন কিনলেন। এই ক্রয় দ্বারা আপনি দুটি জিনিস অর্জন করলেন। একটি হলো মেশিন, আরেকটি হলো কোম্পানি থেকে কমিশন লাভের যোগ্যতা। অর্থাৎ আপনি আরো ক্রেতা জোগাড় করে দিতে পারলে কোম্পানি থেকে কমিশন পাবেন। এতে বুঝা গেল, বিক্রয়টা এক স্থরে শেষ হয় না; বরং আপনার মাধ্যমে এবং আপনার পরবর্তী লোকদের মাধ্যমে তা অনেক স্থরে বিস্তৃত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

ধরুন: “গাছপালা লিমিটেড” নামক একটি কোম্পানি পাঁচ বছর পর লাভসহ মূলধন ফেরত দেয়ার শর্তে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে ‘ক’ নামক ব্যক্তিকে ক্রেতা পরিবেশক বানাল। এরপর ‘ক’ নামক লোকটি উক্ত শর্তে ‘খ’ ও ‘গ’ নামক আরো দুজনকে ক্রেতা- পরিবেশক বানাল। অতঃপর ‘খ’ ও ‘গ’ প্রত্যেকে যথা ক্রমে কোম্পানিতে ‘ঘ’ ‘ঙ’ এবং ‘চ’ ‘ছ’ কে ভেড়াল। এভাবে প্রত্যেক নতুন ব্যক্তি দুজন করে ক্রেতা- পরিবেশক বানাবে।

উপরোক্ত উদাহরণে ‘ক’ নামক ব্যক্তি যেমনিভাবে ‘খ’ ও ‘গ’ নামক ব্যক্তিকে জোগাড় করার জন্য কোম্পানি থেকে কমিশন পাবে তেমনিভাবে নিম্ন স্থরের প্রত্যেক ব্যক্তি ঘ,ঙ,চ,ছ, সহ আরো যতজন এই লাইন দুটিতে নিচের দিকে যোগ হবে তাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্তির জন্য কোম্পানি তাকে কমিশন দিবে। এভাবে আপ লেভেল তথা উপরের স্থরের ক্রেতাগণ ডাউন লেভেল তথা নিম্ন স্থরের ক্রেতা- পরিবেশকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে থাকবে।

এম.এল.এম কোম্পানিগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য এক হলেও কোম্পানি ভেদে এর নিয়মাবলী ও কমিশন বণ্টনের পদ্ধতি ও পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত এ পদ্ধতির প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ম হলো, ডান ও বাম উভয় পাশের নেট না চললে এ স্থরের কোন ব্যক্তি কমিশন পায় না। অর্থাৎ কেউ যদি শুধু একজনকে ক্রেতা পরিবেশক বানায় তাহলে সেও কমিশন পাবে না এবং তার উপরের স্থরের ব্যক্তিগণও কমিশন পাবে না।

এম.এল.এম এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ কারার পর এখন দলীলসহ এর শরয়ী হুকুম বর্ণনা করা হলো:

এম.এল.এম এর শরয়ী হুকুম: মাল্টিলেভেল মার্কেটিং সিস্টেম শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। নাজায়িয হওয়ার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. শরী'আতের একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বেচা-কেনা হবে সরাসরি । বিনা প্রয়োজনে মধ্যসত্ত্বভোগী সৃষ্টি হবে না। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে অযাচিতভাবে বিভিন্ন স্থর ও মাধ্যম সৃষ্টি করা শরী'আতের পছন্দ নয়। এজন্যই 'তালাক্কিয়ে জালাব' ও 'বাইয়ুল হাযির লিল বাদীর' উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। (সহীহ মুসলিম হা. নং ৩৭৯২, ৩৭৯৭)

২. শরীআতে ক্রেতা তথা ভোক্তার স্বার্থ বিক্রেতা তথা ব্যবসায়ীর স্বার্থের উপর প্রাধান্য পায়। এ জন্য শরীআত দালালীকে অপছন্দ করে। (সহীহ মুসলিম হা নং ৩৭৯১) কারণ, এর দ্বারা বিক্রেতা ও দালাল উপকৃত হলেও ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

শরী'আতের এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই এম.এল.এম এর সাথে সাংঘর্ষিক। প্রথম উসূলটি ছিল, বেচাকেনায় অযাচিত মধ্যসত্ত্বভোগী সৃষ্টি না হওয়া। অথচ এম.এল.এম এর মধ্যে এক পণ্য বা সেবার উপকারভোগী হয় অনেক স্থরের লোক। কারণ, পরিবেশককে যে কমিশন দেওয়া হয় তা মূলত ক্রেতার অর্থ থেকেই দেওয়া হয়। এতে ক্রেতা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ, ক্রেতা এই একই মানের পণ্য সাধারণ বাজার থেকে কিনলে অনেক কমে কিনতে পারতো। অথচ এম.এল.এম কোম্পানি নিজ ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন দেওয়ার স্বার্থে ঐ একই মানের পণ্য প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি করছে। আর এতে যেহেতু ভোক্তার স্বার্থ ক্ষুণ্য হচ্ছে তাই এই পদ্ধতি শরীয়ত সমর্থন করে না।

৩. আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'তোমরা বাতিল পন্থায় অন্যের মাল খেওনা' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, বিনিময়হীন উপার্জনই হলো বাতিল পন্থার উপার্জন। (আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ২/১৭২) এম.এল.এম এর মধ্যে বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভক্ষণ করাও পাওয়া যায়। কারণ, এম.এল.এম কারবারে ডাউন লেভেল থেকে আপ লেভেলে যে কমিশন আসে তা বিনিময়হীন হাসিল হয়। অতএব, এই কমিশন অন্যের সম্পদ বাতিল পন্থায় আহরণের অন্তর্ভুক্ত।

৪. লেন-দেনের ক্ষেত্রে শরী'আতের একটি উসূল হলো চুক্তির সময় পণ্য বা সেবা সুনির্ধারিত হতে হবে। যেন এ নিয়ে পরবর্তীতে ঝগড়া-বিবাদ না হয়। কিন্তু,এম.এল.এম এই উসূলেরও পরিপন্থী। কারণ, এম.এল.এম এর একজন ক্রেতা-পরিবেশক কোম্পানিকে তার নির্ধারিত টাকাগুলি দিচ্ছে দুটি জিনিসের

বিনিময়ে ১. নির্ধারিত পণ্য বা সেবা । ২. পরিবেশক হিসেবে কমিশন প্রাপ্তি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিনিময়ের প্রথমটি জানা থাকলেও দ্বিতীয়টি অজানা। কারণ, ক্রেতা নিজের ডানে-বামে সদস্য বানাতে পারবে কিনা , পারলেও দুজন বানাতে পারবে কিনা, কমিশন সে কোন সময় থেকে পেতে শুরু করবে, কত স্থর পর্যন্ত চলবে, এসব কিছুই অনির্ধারিত, অজানা। তাই এই উসূল অনুযায়ীও এম.এল.এম শরীয়ত বিরোধী।

৫. বেচা-কেনার মধ্যে আর একটি শর্ত হলো বেচা-কেনা “গরারু তথা প্রতারণা মুক্ত হতে হবে। আল মাবসূত এর ভাষ্যানুযায়ী “গরারু হলো, এমন চুক্তি যার পরিণাম অজানা। (কিতাবুল মাবসূত ১২/১৯৪) এম.এল.এম এর মধ্যেও “গরারু এর উপস্থিতি রয়েছে। পরিবেশক কোম্পানির সাথে চুক্তি অনুযায়ী নিজ ডাউন লেভেল থেকে কমিশন লাভ করতে থাকবে। অথচ তার ক্ষেত্রে আদৌ ডাউন লেভেল সৃষ্টি হবে কিনা, হলে তা কতদিন এবং কয়টি স্থর পর্যন্ত চলবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যা শরী‘আতের নিষিদ্ধ “আল গরারু এর বাস্তব দৃষ্টান্ত।

৬. হাদীস শরীফে একই কারবারের মধ্যে আরেকটি কারবারকে শর্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ ১/৩৯৮) অথচ এম.এল.এম এর মধ্যে এক কারবারকে আরেক কারবারের শর্ত করা পাওয়া যায়। তা এভাবে যে, এম.এল.এম কোম্পানিগুলোতে পণ্য ক্রয়ের শর্তেই শুধু পরিবেশক হওয়া যায়। অর্থাৎ কোম্পানি থেকে পণ্য ক্রয় ছাড়া পরিবেশক হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে পণ্য ক্রয়কে পরিবেশক হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে। যা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

কোনও কোনও এম.এল.এম কোম্পানি উপরিউক্ত শরয়ী সমস্যা এড়ানোর জন্য দুটি পৃথক ফরমে ব্যবস্থা করেছে। একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম, অন্যটি পরিবেশক হওয়ার আবেদন ফরম। এভাবে হয়তো তারা বুঝাতে চাচ্ছে যে, এখানে পৃথক দুটি চুক্তি হচ্ছে। অথচ এসব কোম্পানির সাথে জড়িত সবাই জানে যে, কার্যক্ষেত্রে একটি চুক্তির জন্য অন্যটি এখনো জরুরী শর্ত। অর্থাৎ পণ্য ক্রয় ছাড়া (দুটি ফরম করা সত্ত্বেও) পরিবেশক হওয়ার কোন উপায় নেই। সুতরাং দুটি ফরম করার দ্বারা এক কারবারের মধ্যে আরেকটি কারবার শর্ত করার নিষেধাজ্ঞা থেকে বের হওয়া যায়নি; বরং তা আগের অবস্থাতেই বহাল আছে।

৭. বিনিময় বিহীন শ্রম এবং শ্রমবিহীন বিনিময় শরীয়তে নিষিদ্ধ। অথচ এম.এল.এম এর মধ্যে এই উভয় সমস্যা বিদ্যমান। বিনিময় বিহীন শ্রম এভাবে পাওয়া যায় যে, এম.এল.এম কোম্পানিগুলোর নিয়ম হলো একজন পরিবেশক যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ডানে-বামে দুজন সদস্য বানাতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত

সে কমিশন পাবে না। অথচ এমটি হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, এই পরিবেশক প্রাণান্ত চেষ্টা করার পরও ডানে-বামে দুজন ক্রেতা জোগাড় করতে পারেনি কিংবা পারলেও নির্ধারিত পয়েন্টের ক্রেতা আনতে পারেনি। অথবা একজন জোগাড় করতে পেরেছে আরেকজন জোগাড় করতে পারেনি। এসব ক্ষেত্রে এই পরিবেশক শ্রম দেয়া সত্ত্বেও কোম্পানি থেকে এক পয়সাও কমিশন পাবে না। আর এই বিনিময় বিহীন শ্রমকেই শরীয়ত নিষেধ করেছে।

বর্তমানে কিছু কিছু কোম্পানি একজন ক্রেতা জোগাড় করতে পারলেও কমিশন দিচ্ছে । কিন্তু এভাবেও বিনিময় বিহীন শ্রম এর নিষেধাজ্ঞা থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। কেননা কেউ চেষ্টা করলো, কিন্তু কাউকে ক্রেতা বানাতে পারলো না তখন তো কোম্পানি তাকে শ্রমের বিনিময়স্বরূপ কিছু দিচ্ছে না।

আর শ্রমহীন বিনিময় এভাবে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য খরিদান্তে পরিবেশক হওয়ার পর যদি সে দুজন ক্রেতা কোম্পানির জন্য নিয়ে আসে এবং তারা প্রত্যেকে আরো দুজন করে চারজনকে এবং এ চারজন দুজন করে আরো আটজনকে কোম্পানির সাথে যুক্ত করে, তবে প্রথম ব্যক্তি ২য় লেভেলের দু' ব্যক্তি নিজের ডাউন লেভেলে আট ব্যক্তি ক্রেতা-পরিবেশক হওয়ার সুবাদে কোম্পানি থেকে কমিশন পেয়ে থাকে। অথচ এ আটজনের কাউকেই প্রথম ব্যক্তি ও দ্বিতীয় স্থরের দুজন কোম্পানির সাথে যুক্ত করেনি; বরং এরা কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়েছে সরাসরি তাদের উপরের ব্যক্তিদের রেফারেন্সে। তা সত্ত্বেও উপরের লেভেলের ব্যক্তিরা তাদের অন্তর্ভুক্তির কারণে নিজের কোন শ্রম ছাড়াই পারিশ্রমিক পাচ্ছে। আর এটাই শরী'আতের নিষিদ্ধ "শ্রমবিহীন বিনিময়ে"র বাস্তব দৃষ্টান্ত।

শরী'আতের দৃষ্টিতে এম.এল.এম নিষিদ্ধ হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো। এ কারণগুলো ছাড়া আরো এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যেসব সমস্যার কারণেও এম.এল.এম অবৈধ প্রমাণিত হয়। সংক্ষিপ্ত এ পরিসরে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

আজকাল আলেম নামধারী কিছু লোক এম.এল.এম এর পথে বই ও লিফলেট বিতরণ করছে। এই স্বার্থান্বেষী মহলের বই পড়ে ধোঁকা খাবেন না। তারা তাদের বই এর মধ্যে যেসব অবান্তর প্রমাণ পেশ করেছে তার উত্তর ফেব্রুয়ারী ২০১২ এর আল কাউসারে দেখে নিবেন।

বি.দ্র. এই লেখায় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার মুফতী বোর্ডের ফাতওয়া ও "মাসিক আল কাউসারু থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

শরী'আতের দৃষ্টিতে বেচা-কেনা

ব্যবসা-বাণিজ্য মানব জীবনের প্রয়োজনীয় এক অধ্যায়। জীবনের বহুবিধ প্রয়োজনের সব কিছুই একজনের পক্ষে নিজে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। বিধায় পরস্পরের প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই ব্যবসার পথে অগ্রসর হতে হয়। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্য জীবন-জীবিকা লাভের অন্যতম এক উপায়। মহান আল্লাহ তা'আলা এর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য নামায সমাপনান্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়তে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা জুম'আঃ১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন নিজে ব্যবসা করেছেন, তেমন এর গুরুত্ব বুঝাতে ইরশাদ করেছেনঃ সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা ক্বিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে। (তিরমিযী হাঃ নং ১২০৯)

তবে ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্যের ভিত্তি রেখেছে পারস্পরিক সহযোগীতার উপর। তাই প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে এ ধরনের মন-মানসিকতা থাকা একান্ত জরুরী। তাহলেই এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান এবং নীতিমালা মেনে নেওয়া সহজ হয়।

সাথে সাথে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার যে, নামায, রোযা, হজ্ব যাকাত ইত্যাদি বিষয়ের বিধি-বিধান জেনে নেয়া যেমন ফরয, তেমন মাসআলা-মাসাইল জেনে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করাও আবশ্যক। এ ফরযের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করলে হারাম এবং সূদী কারবারে জড়িত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। যেমনটি বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায়। অথচ কুরআন-হাদীসে সুদখোর ব্যক্তির ব্যাপারে অনেক ধমকী এবং শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ২৭৯) এজন্য এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরী।

বেচা-কেনার সংজ্ঞা: বেচা-কেনা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা ও তিজারত এগুলো সমার্থক শব্দ। সাধারণ অর্থে লাভের আশায় বৈধ পণ্যের লেন-দেনকে ব্যবসা ও তিজারত বলা হয়। যেমন ফিক্‌হের কিতাবে বলা হয়েছে, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুই পক্ষের পূর্ণ সম্মতিক্রমে মুদ্রা কিংবা বৈধ পণ্যের বিনিময়ে বৈধ পণ্যের হস্তান্তরকে ইসলামী শরী'আতে বেচা-কেনা বলে। হিদায়া-টিকাঃ ৩/১৮

সুতরাং বেচা-কেনা শরীয়ত সম্মত উপায়ে সংঘটিত হওয়ার জন্য মোট ৩টি জিনিষ পাওয়া যেতে হবে।

১. বৈধ মাল হতে হবেঃ মাল না হলে তা বিক্রি করা বা খরীদ করা জায়িয হবে না। যেমনঃ শুকর, রক্ত, মদ, গান-বাদ্যের যন্ত্র, সিনেমার বা নৃত্য অনুষ্ঠানের

টিকেট ইত্যাদি। এগুলো শরী'আতের দৃষ্টিতে মাল নয়, তাই এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় হারাম।

২. পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হতে হবেঃ দোকানদার ক্রেতাকে বললোঃ এটা নগদ নিলে এত দাম, আর বাকী নিলে এত দাম। এখন যদি ক্রেতা শুধু বলেঃ ঠিক আছে। কিন্তু উভয়টির কোনটা নির্দিষ্ট করল না। তাহলে এ বেচা-কেনা জায়িয হবে না। বরং এটা সূদী কারবারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. উভয় পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পাওয়া যেতে হবেঃ অনেকে গায়ের জোরে নির্ধারিত মূল্য থেকে কম মূল্যে জিনিষ ক্রয় করে। এটা হালাল হবে না। অনেক সময় একতরফা মূল্য নির্ধারিত করা হয়। যার প্রতি অন্য পক্ষের সম্মতি থাকে না। এটাও জায়িয নেই।

বেচা-কেনার প্রকারভেদ

বেচা-কেনা মোট চার প্রকার। যথাঃ

১. পণ্যের বিনিময়ে পণ্য (বাইয়ে মুকায়াযাহ)
২. মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য (সাধারণ বিক্রি)
৩. মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা (বাইয়ে সরফ)
৪. নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকী পণ্য ক্রয় (বাইয়ে সালাম)

শর'ঈ হুকুমঃ প্রথম প্রকারে যদি উভয়টির (جنس) তথা জাত এবং (قدر) তথা পরিমাপ পদ্ধতির দিক দিয়ে এক হয়। যেমনঃ ধানের বিনিময়ে ধান বিক্রি করা-তাহলে নগদা-নগদী বিক্রি করতে হবে। এবং উভয়ের মধ্যে পরিমাণের দিক দিয়ে সমতা রক্ষা করতে হবে। নতুবা জায়িয হবে না। আর যদি উভয় দিক দিয়ে ভিন্ন হয় অর্থাৎ, উভয়টির জাত ভিন্ন এবং পরিমাপ পদ্ধতিও ভিন্ন হয় যেমনঃ ধানের বিনিময়ে পাট বিক্রি করা-তাহলে পরিমাণে কম-বেশী করে বেচাও জায়িয হবে। এবং বাকীতে বেচাও জায়িয হবে। আর যদি উভয় দিকের এক দিক দিয়ে ভিন্ন হয় অপর দিক দিয়ে এক হয়- যেমনঃ ধান এবং গম উভয়টির জাত ভিন্ন কিন্তু পরিমাপ পদ্ধতি অভিন্ন- তাহলে কম-বেশীতে বিক্রি জায়িয হবে। কিন্তু বাকিতে বিক্রি করা জায়িয হবে না।

আর দ্বিতীয় প্রকারে (সাধারণ বিক্রিতে) নগদ-বাকী উভয় ভাবেই বিক্রি জায়িয। তৃতীয় প্রকারে (মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার বিক্রয়) উভয়টি এক দেশী হলে কম-বেশী এবং বাকী কোনটিই জায়িয নেই। (হিদায়াঃ৩/৭৯)

আর চতুর্থ প্রকারে তথা বাইয়ে সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত আছে। যেমনঃ

ক. নগদ কত টাকার বিনিময়ে কি পণ্য দেয়া হবে তার জাত নির্ণয় করা।
খ. উক্ত পণ্যের প্রকার বা ধরণ বর্ণনা করা।

গ. গুণাগুণ বর্ণনা করা। অর্থাৎ, উন্নত মানের না মাঝারী ধরনের কিংবা নিম্ন মানের পণ্য হবে তা বর্ণনা করা।
ঘ.মালের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।
ঙ. পণ্য কোন দিন, কোন সময়, কোথায় হস্তান্তর করা হবে তা নির্দিষ্ট করা।
চ. যে পণ্যে বাইয়ে সালাম হবে সে মালটি লেন-দেনের দিন থেকে পরিশোধের দিন পর্যন্ত বাজারে মজুদ থাকা।

উল্লেখিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে বাইয়ে সালাম জায়িয হবে। অন্যথায় নয় এবং এই শর্তগুলো চুক্তিনামার মধ্যে লিখিত থাকতে হবে। (হিদায়াঃ৩/৯৫)

বেচা-কেনার মূলনীতি

১. লেন-দেন কারীদের মাঝে অবশ্যেই লেন-দেনের যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক না হলেও লেন-দেনের বুঝ রাখে এমন সুস্থ মস্তিস্ক, স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। (দুররে মুখতারঃ৪/৫০৪)

২. ক্রয়-বিক্রিয়ের জন্য নির্বাচিত পণ্যের মাঝে অবশ্যেই পণ্য হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। পণ্য হওয়ার যোগ্য না হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যেমনঃ
ক. দ্রব্যটি বেশী সম্মানিত হওয়া, যেমনঃ মানুষ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।
খ. বেশী ঘৃণ্য হওয়া। যেমন শুকর ইত্যাদি।
গ. শরীয়ত কর্তৃক তার ভোগ ব্যবহার হারাম হওয়া। যেমনঃ শরাব, মাদক দ্রব্য, মৃত প্রাণী ইত্যাদি। (দুররে মুখতারঃ ৪/৫০৬)

৩. পণ্য হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। সুতরাং আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা এবং নদী বা পুকুরের পানির ভিতরে মাছ বিক্রি করা জায়িয নেই। (হিদায়াঃ ৩/৫১)

৪. বিক্রেতার নিকট পণ্য উপস্থিত থাকতে হবে। সুতরাং বর্তমানে যে বিদেশ থেকে মাল আমদানি করে তা আনার আগেই উক্ত মালের ডকুমেন্ট বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা আবার আরেক জনের নিকট বিক্রি করে দেয়। এভাবে মাল আসার আগেই কয়েকবার বিক্রি হয়ে যায় এটা জায়িয নেই। (হিদায়াঃ ৩/৫১)

৫. পণ্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা থাকতে হবে। (হিদায়াঃ ৩/৫১)

৬. উক্ত মাল হারাম উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট না হতে হবে। যেমনঃ টি ভি, ভি সি আর, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। (হেদায়াঃ ৪/৫৪)

৭. মালের মূল্য নির্ধারিত হতে হবে। মূল্য অস্পষ্ট থাকলে বেচা-কেনা বৈধ হবে না। যেমন বললোঃ এ মালটা নিয়ে যান ইনসাফ করে দাম দিয়ে দিবেন। কেননা এ ধরনের অস্পষ্টতা পরিণামে আত্ম-কলহ ও ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয়। (হিদায়াঃ৩/৫৪)

৮. বেচা-কেনার চুক্তিতে এমন কোন শর্ত জুড়ে দেওয়া যাবে না যা উক্ত পণ্যের বেচা-কেনার চুক্তির সাথে স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। যেমনঃ বর্তমানে "মাল্টিলেভেল মার্কেটিং" ব্যবসার মধ্যে দালালী শর্ত করা হয়। অথবা বলা হল যে, বাড়িটি বিক্রি করলাম কিন্তু এক মাস আমাকে থাকতে দিতে হবে। কিংবা বলা হল যে, আমাদের থেকে এত টাকার মাল কিনতে হবে। এবং আরো দুজন গ্রাহক সংগ্রহ করতে হবে। (হিদায়াঃ৩/৫৯)

৯. এমন কোন চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয় যেখানে এক পক্ষের নিশ্চিত লাভের ও অপর পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতির শর্ত সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমনঃ জুয়া, হাজী, লটারী ইত্যাদি। (হিদায়াঃ ৩/৫৪)

১০. বেচা-কেনায় কোনরূপ ধোঁকা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ফটকাবাজী ও ভেজাল থাকতে পারবে না এবং এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না যার দ্বারা সাধারণ ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (হিদায়াঃ৩/৫২)

১১. যে মাল জমা রাখলে জনগণের কষ্ট হয় তা জমা রাখা জায়িয নেই। শরীয়াতের পরিভাষায় একে ইহতেকার বা মুজুতদারী বলে। (হিদায়াঃ৪/৪৬৮)

এছাড়াও আরো অনেক নীতিগত বিষয় আছে যা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নেওয়া আবশ্যক। উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে ব্যবসার নামে অবাধ শোষণ, অন্যায় আত্মসাৎ, দ্রব্যে ভেজাল, মাপে কম দেয়া, ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন, মুজুতদারী ও কালো বাজারীর মাধ্যমে বাড়তি মূল্য আদায় বা পর্যাপ্ত মাল থাকা সত্ত্বেও তা আটকে রেখে বাজার মূল্য বৃদ্ধি করা, কিংবা কাউকে বেকায়দায় ফেলে ক্রয়-বিক্রয়ে বাধ্য করা, অথবা কারো বিপদের সুযোগে তার থেকে অধিক হারে লাভবান হওয়ার মানসে ক্রয় বিক্রয় করা, পণ্যের উপর এক চেটিয়া দখল সৃষ্টি করে বাড়তি মূল্যে বিক্রি করা ইত্যাদি ধরনের বেচা-কেনা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয এবং অবৈধ ও হারাম। এবং এর দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল নয়। এধরনের অর্থ দ্বারা হজ্ব ও উমরা করা, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করার দ্বারা উক্ত হারাম পয়সার দায় থেকে আল্লাহর দরবারে রেহাই পাওয়া যাবে না। বরং এর জন্য হক্কানী মুফতীদের নিকট থেকে শরী'আতের বিধান জেনে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এবং খালিস দিলে তাওবা-ইস্তিগফার করলে আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।

বেচা-কেনার প্রচলিত কয়েকটি সূরত এবং তার শর'ই বিধান

১. বীজ ধানের বিক্রিঃ আমাদের সমাজে সাধারণ ধান দিয়ে বীজ ধান নেওয়া হয় কমবেশী করে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা নাজায়িয। এর থেকে বাঁচার উপায়

হলঃ প্রথমে টাকা দিয়ে বীজ ধান কিনবে। এরপর বীজ ধানের বিক্রেতা ঐ টাকা দিয়ে সাধারণ ধান কিনবে। (হিদায়াঃ৩/১০৪)

২. আর একটা ব্যবসা হল টাকা পয়সার বেচা-কেনা, টাকা ভাঙ্গানো, ছেড়া টাকা দিয়ে ভাল টাকা নেওয়া। এগুলোকে বাইউস্ সরফ বলে। এখানে সাধারণভাবে কমবেশী করা জায়িয নেই। এবং কোন পক্ষ বাকী রেখে লেন-দেন করাও জায়িয নেই। প্রয়োজনে করজ নেয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ ৫০০ টাকার খুচরা করার প্রয়োজন। কিন্তু অপর পক্ষের নিকট ঐ পরিমাণ নিবে না। বরং ৩০০ টাকার খুচরা আছে। তখন খুচরা হিসাবে ৩০০ টাকা রাখবে। পরে এক সময় ঐ ৩০০ টাকার করজ পরিশোধ করে আমানতের ৫০০ টাকা নিয়ে আসবে। (হিদায়াঃ৩/১০৪)

৩. গ্রাম থেকে আগত ব্যক্তির কাছ থেকে কম দামে মাল ক্রয় করে শহরের লোকদের নিকট অতিবেশী দামে বিক্রি করা। এর দরুন যদি গ্রামের বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা শহরের লোকদের কষ্ট হয়। এটাও নাজায়িয। (হিদায়াঃ৩/৬৭)

৪. শহরের ব্যবসায়ী গ্রামের ব্যবসায়ীর দালাল হয়ে তার মাল শহরের লোকদের নিকট বেশী দামে বিক্রি করা। এটাও নাজায়িয। (হিদায়াঃ ৩/৬৭)